International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 96-102
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

নারীবাদ ও তার মার্কসীয় দিকদর্শন

ড. অরূপ অধিকারী
শিক্ষক, গোলগ্রাম গোলাম ইমাম হাইস্কুল (উ. মা.) গোলগ্রাম রায়না, পুর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The terms feminism' has many different uses and its meaning are often contested. Generally we can say feminism is a movement which claimed political, economic. Cultural and' social equality for women. It aimed at defining, establishing and defending equal rights and equal opportunities for women. Feminism is both an intellectual commitment and a political movement that seeks justice for women. In the present text, feminism and its diverse sense and also Marxist theory of feminism will be discussed on the basis of authentic sources.

Keywords: Feminism, Marxism, Patriarchy, Phallocentrism.

'নারীবাদ' (Feminism) আখ্যাটি যদিও বর্তমানে বহুল প্রচলিত, তথাপি নারীবাদ বলতে ঠিক কি বোঝায় সে বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। এর ফলস্বরূপ নানা অহেতুক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নারীবাদ- এর মতাদর্শ ও কর্মসূচি সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। অনেকে মনে করেন নারীবাদ এর অর্থ হল যথেচ্ছ স্বেচ্ছাচারিতা। আবার অনেকে নারীবাদ বলতে পাশ্চাত্যের এক কল্পনাবিলাসী ধ্যান ধারণাকে বুঝে থাকেন। বস্তুতঃ নারীবাদ সম্পর্কে এরূপ একটা অস্পষ্টতার জাল মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

নারীবাদ সম্পর্কে একটি সংহত ও সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া বেশ কঠিন। কেননা, নারীবাদ কোন নির্দিষ্ট একক ধারণা নয়। তবে সাধারণভাবে বলা যে, নারীবাদ হল এমন একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পদক্ষেপ যা সেই সমস্ত পদ্ধতি, সংগঠন এবং মনোভাবকে মুছে ফেলতে চায় যেগুলি পুরুষ প্রভুত্বকে প্রতিপালন করে বা বজায় রাখার চেষ্টা করে। নারীবাদ পুরুষতন্ত্রের সেই সমস্ত চিন্তাধারাকে পুনর্বিচার পূর্বক সংশোধন করতে চায় যেগুলি নারীর নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি প্রায় সকল প্রকার অভিজ্ঞতা তথা অধিকারকে অবমাননা করে। নারীবাদের অর্থ সমাজ-সংসারের বিরুদ্ধে আবেগময় উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, স্বাধীনতার যথেচ্ছাচার নয়, নারীবাদ হল প্রথাগত (traditional) পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। নারীবাদ পুরুষের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়, পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির (WBDWA) সভাপতি কনক মুখোপাধ্যায় বলেছেন- 'নারী আন্দোলন পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। যে সমাজ ব্যবস্থা নারীকে পরাধীন করে রেখে নারীকে পুরুষের পদানত করে রেখেছে, সেই শ্রেণি বিভক্ত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সেই সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক শ্রেণিসমাজের

শোষক শ্রেণি পুঁজিপতি জমিদারদের বিরুদ্ধে।"[১] কাজেই নারীবাদের প্রকৃত স্বরূপ, এর মতাদর্শ ও কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত হতে হলে এর গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

সিমোন দ্য বোভোয়া (Simone de Beauvoir) তাঁর "The Second Sex" গ্রন্থে বলেছেন "নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে।"[২] অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে এক একজন শিশু স্ত্রী-অঙ্গ নিয়ে জন্মায় এটুকুই সত্য। কিন্তু জন্মক্ষণে সে জানে না সে নারী অথবা পুরুষ। এরপর সমাজ তার ওপর 'কোড অব কন্ডাক্ট' (Code of Conduct) এর বিধিনিষেধ আরোপ করে তাকে প্রতিনিয়ত বুঝিয়ে দিতে চায় সে একজন নারী। তাকে টিপ পরিয়ে, ত্বক কোমল রাখার জন্য বিভিন্ন ক্রিম মাখিয়ে, চুল বেঁধে দিয়ে, পুতুল খেলিয়ে, রান্নাবাটনা ধরিয়ে দিয়ে, একা একা বাইরে যেতে নেই বলে, চুল খোলা রেখে বাইরে বেরোতে নেই বলে, একটু বড় হলে তার বহিরঙ্গ সম্পর্কে সচেতন করিয়ে তাকে সামাজিক ভাবে মেয়েলি করে তোলা হয়। এইভাবে যা ছিল নারী-পুরুষের নিছক জৈবিক বা যৌন প্রভেদ (biological or sex difference), তা কালক্রমে পরিণত হয়েছে লিঙ্গ বৈষম্যে (gender difference)।

সাহিত্যে, দর্শনে, সঙ্গীতে, ধর্মনীতিতে, আচরণে, আলাপ চারিতায়, গল্পে নারী বিদ্বেষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়ঃ

১। প্রথাগত সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকার, সম্মান ও স্বার্থকে পুরুষের তুলনায় অনেক ছোট করে দেখা হয়েছে।

২। নারীর গৃহস্থালি কাজকর্ম, যেমন, রান্না করা, ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের সেবা যত্ন করা ইত্যাদি কর্মে নারী যে শ্রম প্রদান করে তার নৈতিক ও সামাজিক মূল্যকে অস্বীকার করা হয়েছে।

৩। চিরাচরিত ব্যবস্থায় মনে করা হয় যে, পুরুষের তুলনায় নারী নৈতিকভাবে অনগ্রসর।

৪। স্বাধীনতা, স্বনিয়ন্ত্রণ, মানসিক দৃঢ়তা, যুক্তিবুদ্ধি, সংস্কৃত, স্বাতিক্রমন ইত্যাদি কথিত পুরুষোচিত গুণগুলিকে অধিক মূল্য প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে পরস্পর নির্ভরতা, একত্রিত হওয়া, প্রকৃতি নির্ভরতা, শান্তিপ্রিয়তা, আবেগ, যুথবদ্ধতা প্রভৃতি গুণকে মেয়েলি বলে অবমাননা করা হয়েছে।

৫। নৈতিক বিচারের পুরুষালি ধারা যা বিধি, সার্বিকতা ও নিরপেক্ষতার উপর জোর দিয়ে থাকে তাকে অধিক সমর্থন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নৈতিক বিচারের যে ধারায় সম্পর্ক, বিশেষত্ব, আসক্তি ইত্যাদি গুণগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে কতটা ছোট করে দেখা হয়। মেয়েরা এরকম হবে, আর ছেলেরা ওরকম হবে এর এতটুকু অন্যথা হলেই সে বিচ্যুত, সৃষ্টিছাড়া, এরূপ একটি ধারণ কয়েক সহস্র বছর ধরে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রোথিত করে দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব নারীর প্রতি অসাম্য ও বঞ্চনার এক আপাত অদৃশ্য চোরাবালি সৃষ্টি করেছে। নারী বিদ্বেষের এই যে আপাত অদৃশ্য চোরাবালি তার প্রকৃত স্বরূপটি বুঝতে হলে যৌন পরিচয় (Sex-identity) ও লিঙ্গ পরিচয় (gender identity) এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। বর্তমানে নারীবাদীরা এই দুটি বিষয়কে সবসময় আলাদা করে দেখেন। যৌন পরিচয় হল জীববৈজ্ঞানিক কারণ-পরমপরার অনিবার্য পরিণতি, যা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কিছু অঙ্গ তথা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। জননাঙ্গ ও তার সম্পর্কিত কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং জিনের গঠনের দ্বারা নারী-পুরুষের পরিচয় স্থির হয়ে থাকে।

অপরলক্ষে লিঙ্গ পরিচয় কোন জৈবিক (biological) বিষয় নয়, এটি হল সামাজিক সৃষ্টি। প্রতিটি সমাজ নারী ও পুরুষের কাছে বিশেষ কতকগুলি আচরণ প্রত্যাশা করে এবং তদুদ্দেশ্যে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক আচরণ ও কর্মনীতি (Code of Con-duct) স্থির করে দেয়। জন্মের পর থেকেই এই লিঙ্গ পরিচয় শুরু হয়ে যায়। সাধারণ আলাপচারিতায়, আচরণে, সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, সঙ্গীতে লিঙ্গ পরিচয়ের এই সমাজ কল্পিত বৈষম্য চলতে থাকে প্রতিনিয়ত।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট এই যে কৃত্রিম লিঙ্গ বিভাজন প্রকল্প তার সব থেকে সংকীর্ণ দিকটি হল সমাজ যেগুলিকে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে তার বিপরীত বৈশিষ্ট্যসমূহ নারীত্বের জ্ঞাপক হয়। অন্যায় পুরুষ প্রাধান্যের অন্তিম ফলস্বরূপ বধূ হত্যার কথা বলা যায়। পুরুষের বিদ্বেষসূচক আচরণের চেহারাটা যে কখন গতি পরিবর্তন করে তা মেয়েদের খেয়াল থাকে না। সতীদাহ গেলে বধূহত্যা, বধূহত্যা গেলে কর্মক্ষেত্রে যৌন লাঞ্ছনা, এইভাবে একটার পর একটা এসেই যায়। নারীর প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ কখনও স্পষ্ট, কখনও প্রচ্ছন্ন। এই বৈষম্যমূলক আচরণ প্রধানত তিনটি স্তরে কাজ করে। স্তরগুলি হলঃ (১) যৌন বিদ্বেষবাদ (Sexism), (২) পুরুষতন্ত্র (Patriarchy) এবং (৩) পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ (Phallocentrism)।

প্রথম স্তরের নারী-বিদ্বেষ কাজ করে পুরুষের আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। কথা বার্তা, আচার-আচরণ, মনোভাব, তত্ত্বরচনা ইত্যাদির মাধ্যমে নারীনিন্দার যে কৌশল তাই সেক্সিজম (Sexism) বা যৌনবিদ্বেষবাদ। মেয়েদের অশালীন মন্তব্য করা, শারীরিক ও মানসিক ভাবে হেনস্থা করা, স্ত্রীকে অহেতুক প্রহার, ধর্ষণ, বধূহত্যা ইত্যাদি সব কিছুই সেক্সিজমের পথ।

সেক্সিজম বা যৌন বিদ্বেষবাদের মূল নিহিত আছে সেই সুসংবদ্ধ বা তন্ত্রবদ্ধ নারী বিদ্বেষের স্তরে, যা ‘পুরুষতন্ত্র’ বা ‘প্যাট্রিয়ারকি’ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতি, প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি ও পরিবারের একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, এগুলি সবই পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যেই গড়ে ওঠে। পুরুষের সবময় কতৃত্বই পুরুষতন্ত্রের লক্ষণ। পুরুষ রক্ষক, নারী রক্ষিতা এটাই হল পুরুষতন্ত্রের কালোমুখোশ। পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশে তাই শোনা যায়। বউ এর রোজগারে যে পুরুষ খায় সে আবার পুরুষ নাকি, পুরুষ মানুষ হয়ে বউ এর কাজ (যেমন তরকারি কাটা, জামাকাপড় কাচা) করছে ইত্যাদি মন্তব্য। এর থেকে এটা পরিষ্কার যে, পুরুষতন্ত্রের চোখে পরিবার বা গৃহের মধ্যে পুরুষেরই কতৃত্ব থাকবে বা থাকা উচিত এবং নারীর কতৃত্ব করার বিন্দুমাত্র অধিকারই নেই। শুধু পরিবার বা গৃহের মধ্যেই নয় সমাজের প্রতিটি স্তরেই রয়ে গেছে পুরুষতন্ত্রের গোপন হাতছানি।

তৃতীয় স্তরের নারী-বিদ্বেষ কাজ করে প্রচ্ছন্নভাবে। নারী বিদ্বেষের এই স্তরটি পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ বা ফ্যালোসেন্ট্রিজম (phallocentism) নামে অভিহিত হয়, যা চিন্তাভাবনার স্তরে পুরুষ প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে যুক্তি ও তত্ত্বচিন্তা রয়েছে তার মধ্যে পরোক্ষ ভাবে পুরুষ পক্ষপাতিত্ব রয়ে গেছে। অ্যারিস্টটল, প্লেটো, কান্ট, এমনকি অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ দার্শনিকগণের তত্ত্বসমূহ পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদের শিকার বলে আজকের নারীবাদীরা মনে করেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, এমনকি সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম সর্বত্র নারীর প্রতি একটা বিদ্বেষসূচক দৃষ্টিভঙ্গী রয়ে গেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পুরুষকেন্দ্রিক সমাজে নারী যুগযুগ ধরে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অবহেলিত ও অত্যাচারিত হয়ে এসেছে। সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষের এই

বৈষম্যমূলক সম্পর্ক ও নারীর প্রতি অবিচারের দিকে এখন সমাজ- সংস্কারকদের চোখ পড়েছে। মেয়েদের সমর্থনে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন বা আসছেন। এর ফলে সামাজিক চিন্তা ও চেতনার স্তরে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির অনেকখানি রদবদল হয়েছে। শিক্ষা, রাজনীতি, চাকরি ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রে নারীরা এখন অনেকটা এগিয়েছে। পুরুষদের দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র আধিপত্য এখন অনেকক্ষেত্রেই মেয়েদের দাপটের সঙ্গে বিচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নারী পুরুষ সম্পর্কের বৈষম্য এখনও বর্তমান। আজও পুরুষ প্রাধান্যের গোপন হাতছানি ও তার ফলস্বরূপ নারী বিদ্বেষ অব্যাহত। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমগুলির দিকে নিক্ষেপ করলেই নারী বিদ্বেষের সাম্প্রতিক চিত্রটি পরিস্কার হয়ে যায়। খবরের কাগজের পাতায় প্রায় নিত্যদিনের খবর-অমুক নারী ধর্ষিত হয়েছে। আজও মন্দিরে দেবদাসী হিসাবে ছোট ছোট মেয়েদের উৎসর্গ করার আড়ালে তাদের দেহব্যবসায়ে নামানো হয়। এখনও রাস্তাঘাটে, পাড়াগ্রামে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে যৌন নিগ্রহের শিকার হতে হয়। সামাজিক চেতনার বিকাশ না হলে এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত সচেতন সামাজিক পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত মেয়েদের পক্ষে বিভিন্ন আইন শুধু ফাঁকা কলসীর আওয়াজ থেকে যাবে মাত্র। এই প্রসঙ্গে আমরা S.C Dube-এর Indian Society বইটি থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করতে পারি- "Even after four decades of Independence one frequently reads of bride burning and dowry death. Other forms of lesser violence are: heaping indignities on the wife and her relation on the paternal side, making the wife do too much work with little rest, failing to provide her adequate nutrition, and mentally torturing her on several scores. Even highly educated and well-piaced women are not immune from such maltreatment, although the situation is changing"[৩] এখানে মনে রাখা দরকার যে আলোচ্য উদ্ধৃতিটি ভারতে নারী বিদ্বেষ প্রসঙ্গে বুঝতে হবে। যদিও এই কথাগুলি অন্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অনেকখানি প্রযোজ্য, তথাপি এগুলি প্রধানত ভারতীয় সমাজে নারী বৈষম্যকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে।

বিভিন্ন মতবাদে নারী বৈষম্যের বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী তার সমাধান সূত্রের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অস্তিবাদ (Existentialism), মানবতাবাদ (Humanism), জীবতত্ত্ববাদ (Biologism), মনঃসমীক্ষণবাদ (Psycho-analysis theory), উদারনীতিবাদ (Liberalism), আমূল পরিবর্তনবাদ (Radicalism) ও মার্কসবাদ (Marxism) প্রভৃতি মতবাদে নারী বৈষম্যকে বিভিন্নভাবে দেখা হয়েছে এবং কিভাবে এই বৈষম্যের অবসান সম্ভব সে বিষয়ে দিক্‌দর্শন করা হয়েছে। আমরা এখানে মার্কসীয় তত্ত্বের (Marxist theory) দৃষ্টিকোণ থেকে নারী বৈষম্যের বিভিন্ন দিক ও তার সমাধানসূত্র বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

মার্কস এর দ্বন্দ্বাত্মক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী নারী-বিদ্বেষের সমস্যাটিকে শোষিত সর্বহারা শ্রেণির সমস্যার সঙ্গে একাত্ম করে বুঝতে হবে। মার্কসীয় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে যে, শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব এবং শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে তবেই সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে কোন শ্রেণি বৈষম্য থাকবে না। ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ধারণা এবং মানবসমাজের অগ্রগতির এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী শোষকশ্রেণি (বুর্জোয়া) কতৃক সর্বহারা শ্রেণিকে (প্রলেতারিয়েৎ) শোষণের বিষয়টি দীর্ঘস্থায়ী নয়, অনুরূপভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবহেলিত অবস্থাও ক্ষণস্থায়ী। শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজে শ্রেণিশোষণের সম্পূর্ণ অবসান হলে সর্বহারা শ্রেণির সাথে সাথে নারীর অবহেলিত অবস্থা ও পরাধীনতার অবসান হবে।

মার্কসবাদই হল একমাত্র তত্ত্ব যা নারীর অবহেলিত অবস্থার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখায় যে, একমাত্র শ্রেণি শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজেই নারীর পূর্ণমুক্তি সম্ভব। তাই ভি.ই. লেনিন মার্কসীয় তত্ত্বকে ‘সর্বশক্তিমান’ (omnipotent) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪] এই সর্বশক্তিমান মার্কসবাদী তত্ত্বই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পূর্বক দেখিয়ে দেয় যে, মনুষ্য সমাজের সূচনা থেকেই নারী পুরুষের পরাধীন ছিল না। তাই গোড়া থেকেই যে মানবসমাজ পিতৃতান্ত্রিক ছিল, মানুষের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইতিহাসের গতিপথ বিশ্লেষণ করে মার্কসীয় তত্ত্ব দেখিয়েছে যে, সভ্যতার প্রাক্‌পর্বে বিবাহ ও পরিবার প্রথার ভিত্তিকে আপাতভাবে অনৈতিক বলে মনে হলেও সেখানে লিঙ্গ বৈষম্যের কোনও স্থান ছিল না, বরং এমন পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল যেখানে পুত্র বা কন্যার সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের মানদণ্ড ছিল মাতৃপরিচয় এবং মাতৃতন্ত্রই ছিল সমাজের মূল ভিত্তি। এর ফলে দেখা যায় যে, তথাকথিত আদিম সমাজে নারী খুব উঁচু ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। বিভিন্ন দেশের কাব্য, মহাকাব্য ও প্রাচীনযুগের ভাস্কর্যশিল্পে দেবীপূজা, দেবীমূতির আধিক্য মাতৃতান্ত্রিক তারই ইঙ্গিত বহন করে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা কিভাবে পুরুষতান্ত্রিককতায় পর্যবসিত হয় এবং পরবর্তীকালে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণ হয় মার্কসীয় তত্ত্বে এর একটা সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। ইতিহাসের গতিপথ বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখিয়েছেন যে, সভ্যতার অগ্রগতি যেমন সমাজের উন্নয়নকে বাড়িয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সমাজে শোষণ, অত্যাচার ও বৈষম্যের চোরাবালি তৈরি করেছে। অর্থাৎ কিনা, সমাজ ও সভ্যতার স্বরূপটি একপেশে বা একমাত্রিক নয়, এর চরিত্রটি দ্বান্দ্বিক একই সঙ্গে যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক। সভ্যতার এই দ্বিমাত্রিক দ্বান্দ্বিক চরিত্রই সমাজের সংকটের কারণ। আদিম সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছু ছিল না। ক্রমে সমাজের একটি স্তরে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হলে শ্রমবিভাজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শ্রমবিভাজনের ফলে দ্রুত উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার মানসিকাতার সৃষ্টি হয়। এর অন্তিম ফল স্বরূপ এতদিনের স্বীকৃত মাতৃতান্ত্রিকতা ও মাতার অধিকার (mother right) অপসৃত হয়, তার জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয় পুরুষ প্রাধান্য ও ক্রমে ক্রমে পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসন, আর এভাবেই লিঙ্গবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গ বৈষম্যের প্রাকট্য দেখা দেয়। নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে পুরুষতান্ত্রিকতার গোপনফাঁদে আবদ্ধ করা হয় এবং সমাজের ব্যবহারিক ক্ষেত্র থেকে নারীর পশ্চাদাপসরণ ঘটে গৃহের অভ্যন্তরে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দ্বারা মার্কসবাদ দেখিয়েছে যে, নারী জাতির পরাধীনতার মূল কারণ শ্রেণিশোষণ ব্যবস্থা। শ্রেণিশোষণের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে নারীর পরাধীনতা ও শোষণ নানারূপে দেখা গিয়েছে। আর এই শ্রেণিশোষণের মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তন। ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের ফলে এক শ্রেণির পুরুষ ঐ মালিকানার অধিকার ছিনিয়ে নিল এবং অন্যশ্রেণির পুরুষদেরকে তাদের দাসরূপে শোষণ করতে শোষণ করতে থাকল, শারীরিক ও মানসিকভাবে। ওই সময়ই নারীদের ঠেলে দেওয়া হল পুরুষাধীন পরিবারগুলির গৃহকর্মের মধ্যে। নারী তার ভরণপোষণের জন্য পুরুষের অধীন হয়ে পড়লো। ফলে শোষিত পুরুষ শ্রেণির সঙ্গে নারীজাতির ভাগ্য একাত্ম হয়ে গেল। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরে শোষিত পুরুষশ্রেণি বা শ্রমিক শ্রেণির সাথে নারী সম্প্রদায়ও বিভিন্নভাবে শোষিত হয়ে এসেছে। দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজে শোষিত পুরুষ বা শ্রমিক শ্রেণি ও সমস্ত শ্রেণির নারীকে কোন না কোন ভাবে শোষণ করা হয়েছে। আর পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এই শোষণের মাত্রা চরম পর্যায়ে চলে যায়। তাই মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোকে উচ্ছেদ করতে না পারলে নারী পুরুষের সুষম,

স্বাভাবিক, আত্মিক সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নারীর পূর্ণমুক্তির জন্য প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারীয় ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক সমাজেই নারীর পূর্ণমুক্তি সম্ভব। আর এখানেই সর্বহারা প্রলেতারিয়েৎ শ্রেণির মুক্তির সঙ্গে নারী জাতির মুক্তির সমস্যাটি অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে আছে।

মার্কসীয় বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে, পুঁজির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ হলে তবেই শ্রেণি শোষণের অবসান হবে। আর সেই শ্রেণি শোষণের অবসানের মধ্য দিয়েই নারী জাতির শোষণের অবসান হবে। শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিলুপ্তি ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলে তবেই শোষিত নারী সমাজের পূর্ণ মুক্তি সম্ভব। শোষিত নারী সমাজের পূর্ণমুক্তির রূপটি দেখা যায় রাশিয়ার ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে। লেনিন প্রথম থেকেই প্রলেতারিয়েৎ শ্রেণির মুক্তির সঙ্গে নারীমুক্তির প্রশ্নটি তুলেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ “প্রলেতারিয়েৎ শ্রেণি কখনই পূর্ণমুক্তি লাভ করতে পারে না, যদি না তা নারীদের জন্য এঙ্গেলস বর্বরযুগ (barbarism) বলেছেন। এই পর্যায়ে নর-নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে বংশ জাতি গোত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে কিছু বাধানিষেধ গড়ে ওঠে এবং যৌথ বিবাহ প্রথার বিলোপ হতে শুরু করে। তৃতীয় পর্যায়ে মানব সমাজ সভ্যতার যুগে (Civilisation) প্রবেশ করে। এই সময় থেকে মানুষ শিল্প সংস্কৃতি চর্চ্চার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এই যুগে একবিবাহপ্রথার উদ্ভব হয় এবং বহুগামিতা বা বহুভর্তৃপ্রথা সমাজে নীতিবিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হতে শুরু করে।

সমাজ বিবর্তনের এঙ্গেলস-এর উপরোক্ত বিশ্লেষণ হতে বোঝা যায় যে, মানব সমাজের আদিম স্তরে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে পুঁজিবাদ প্রাধান্য পেয়ে থেকে, সেখানে সম্পত্তির অধিকার, পিতৃতান্ত্রিকতা ও লিঙ্গবৈষম্যের সুযোগ নিয়ে আইনের দৃষ্টিতে একবিবাহ প্রথাকে অনুসরণ করা হলেও কার্যতঃ বহুগামিতা পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ বলে পরিগতি হয়। এর ফলে নারী আর্থিক, দৈহিক ও মানসিক দিক হতে অবদমিত হয়। অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজের এই নিষ্ঠুর ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেও নারীসমাজ সুবিচার পায় না। আবার নারী যদি এর বিকল্প উপায় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আইনসিদ্ধ বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে যায় তাহলে সে সমাজের কাছে পায় নিন্দা ও ভর্ৎসনা। এইভাবে পুরুষশাসিত সমাজে তথা পুঁজিবাদী সমাজে নারীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই নারী সমাজের পূর্ণমুক্তির জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিলোপসাধন ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা। মার্কসীয় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হতে আমরা দেখতে পাই যে, একমাত্র সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সম্ভব। আর পুঁজিবাদী সমাজের উচ্ছেদ হলে শ্রেণি শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর ঐ শ্রেণিশোষণহীন সাম্যবাদী সমাজে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির সাথে নারীজাতিরও পরাধীন অবস্থা থেকে মুক্তি হবে।

গ্রন্থ উদ্ধৃতি:

১. নারী আন্দোলনের কয়েকটি কথা, পঃবঃ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ-২৫
২. THE SECOND SEX, Tr. By H.M. Parshlev, penguin Books, Newyork 1949. Page- 295
৩. Indian Society, National Book Trust, India, Delhi, 1990, page-113
৪. Lenin: Vol.1, National Book Agency Private Limited.

৫. F. Engles, Origin of the Family, Private property and the state, progress publishers, Moscow, 1974
৬. Lenin: February 21, 1920
৭. Lenin: Letter from After, Letter III
৮. Origin of the family, private property and the state, progress publishers, Moscow, 1974
৯. Origin of the family, private property and the state, progress publishers, Moscow, 1974.

গ্রন্থপঞ্জী

১. Engels Fredarich, The Origin of Family, Private Property and the state, progress, Moscow, 1974.
২. দত্তগুপ্ত শোভনলাল ও ঘোষ উৎপল, মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব পঃবঃরাঃপুঃপঃ, কলকাতা, ২০০০।
৩. মুখোপাধ্যায় কনক, নারী আন্দোলনের কয়েকটি কথা, পঃবঃ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা, ১৯৮৬ (৩য় সং)।
৪. মুখোপাধ্যায় কনক, মার্কসবাদ ও নারী মুক্তি, পঃবঃ গণতান্ত্রিক সমিতি, কলকাতা, ১৯৭৫।
৫. Mukherjee Kanak, Women’s Emancipation Movement in India, National Book Centre, New Delhi, 1989.
৬. S.C. DUBE, Indian Society, National Book Trust, India, New Delhi, 1990
৭. Simone De Beauvoir, The Second Sex, Tr. H.M. Parshev, penguin Books, Newyork, 1949.